। নিবেদন ।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় । আমার প্রিয় ঔপন্যাসিক । এই নামটি আমার প্রাত্যহিক জীবন পঞ্জিকায় অনেক বেশী মূল্যবান । কৈশোরের চৌকাঠে পার হইয়া যখন রূপকথার স্বপ্নলোক দেখিবার পালা সাঙ্গ করিয়া খেয়া তরী বাহিতে বাহিতে জীবনের অন্য ঘাটের পথিক হইতে মন চাহিল, তখন যে ভোরাই তারার আলোর হাতছানিতে চমকাইয়া উঠিলাম এক অজানিত মুহূর্তে – সেই তারা আমার চেতনার গভীরে আঁকা হইল বিভূতিভূষণ নামে। বুদ্ধি তখনও বোধিতে রূপ লয় নাই, চেতনা তখনও চৈতন্যের সোপান পার হইয়া রসঘন কোন চিন্ময় দর্শনে সংকেত আনে নাই – আমার সেই মন আমার সেই মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে পথের পাঁচালী যে মনুভূতির মনুরণন তুলিয়াছিল – কালের যাত্রাপথে আজও তাহা আমার কাছে অমূল্য পাথেয় । দার্শনিক ককতো – বলিয়াছেন সাহিত্য স্রষ্টার ছায়াঘন প্রাণান্ত মনের এক অনবদ্য উপহার । পথের পাঁচালী এই সত্যকে স্বীকার করিতে অফুরন্ত উৎসাহ জোগাইয়াছিল আমাকে । পথের পাঁচালী যে মনের সৃষ্টি সেই মনে ক্লান্তি নাই, সেই মন বেদনায় বাস্তব, সেই মন যন্ত্রণায় অনুগ্রহ সমান। এই অনবদ্য সৃষ্টির স্রষ্টাকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা সব ডালি উজার করিয়া ঢালিয়া দিয়াও আমি শান্তি পাই নাই – আমার সেই দিনের সেই মনে ।

যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়াই আমি আমার সমস্ত মনুভূতি দিয়া ভাবিতে সুরু করিয়াছিলাম, এই মহান শিল্পী মহত মনের গভীরে প্রবেশ করিয়া ডুবুরির মত একদিন আমি মনুসন্ধান করিয়া দেখিব কোন রত্নরাজি দিয়া তাঁহার চেতনা এবং চৈতন্য গড়া । দিন গিয়াছে মাস গিয়াছে বছর অতিক্রান্ত হইয়াছে একটার পর একটা কিন্তু আমার সেই মনুসন্ধিৎসা কোনদিন এতটুকু ভাটা পড়ে নাই। পথের পাঁচালী হইতে সুরু করিয়া ইছামতী পর্যন্ত আমি লেখকের পদচিহ্ন ধরিয়া সমস্ত পথ পার হইবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেক চড়াই উতরাই অনেক আঁকা বাঁকা বন্ধুর উপত্যকা অনেক সময় আমাকে শ্রান্ত করিয়াছে ঠিক কিন্তু উহারা আমার জীবনের একটি যতি মাত্র, উহারা ইতি নয়। স্রষ্টার সৃষ্টিতে জোয়ারের যে ঢেউ উঠিয়াছিল আমার জীবন নদীতে সেই নদী ভাটার গানে মুখরা হইতে শিখে নাই কখনও সেই আমার জীবন নদী লেখকের জগত জুড়িয়া বহিয়া চলিয়াছে আপন মনে একাকী ।

যৌবনের নদী আজ তারুণ্যের তোরণে প্রবাহমান। আজও ইহার চলার শেষ নাই। আজও দিবসে নিশীথে বিভূতিভূষণ নামে সেই যাদুকরের জাহ্নবীতটে মিশিতে চাহে আপনার আকুলক্রন্দন। প্রকৃতিকে এমন করিয়া দেখা প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য সুধা এমন করিয়া আকণ্ঠ পান করা, ছায়াতে আলোতে সলজ্জা প্রকৃতির আবরণ এমন ভাবে উন্মোচন করিয়া কানে কানে এমন করিয়া কথা বলা বা গান গাওয়া – যাদুদণ্ড যাহার হাতে আছে সেই যাদুকরই বোধ হয় পারে। অপরাজেয় কথাশিল্পী কারিগরের মত কথা গড়িয়াছে শালবনের কারখানায় মহুয়া বনের মালঞ্চে মালঞ্চে, অপরাজেয় কথাশিল্পী ভাষা বাঁধিয়াছে পাহাড়ে পাহাড়ে শিকড়ে কন্দরে, উপল মুখরা ঝর্ণার ধারে বসিয়া মহাসাধকের হাতিয়ার ঘসিয়া। প্রকৃতির সহিত এমন একাত্মতা যাহার তাঁহার পায়ে শতকোটি প্রণাম করিয়াছি সারাজীবন ধরিয়া। তাঁহার জীবন শরিক হইতে চাই শুনিয়া আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন, আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক নির্মল সান্যাল এবং আরও অনেকে তাঁহাদের অপরিশোধ্য ঋণ কোন দিন কোন কালে শুধিবার নহে।

কোথায় কোন খনিতে লুকাইয়া আছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর শিল্প সম্ভার সব, কোথায় কোন নদীর কূলে, কোন পাহাড়ের বক্ষপিঞ্জরে বন্দী হইয়া আছে তাঁহার বাণী গুলি সব। কোথায় কোন পলিমাটির আঁচলে জড়াইয়া আছে তাঁহার পায়ের চিহ্ন আর নয়নের জল – আমি দুই চোখ ভরিয়া তাহাই দেখিতে চাই, দুই কান পাতিয়া তাহাই শুনিতে চাই – আর তাই গিয়াছি এখানে সেখানে শহর হইতে শহরতলীতে, গ্রামে গঞ্জে গিয়াছি সব গ্রন্থকারিদের কাছে। (কুচবিহার মহারাজার গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার)।

[illegible] যেখান হইতে যাহা পাইয়াছি জীবন ঝুলিতে সংগ্রহ করিয়াছি সব একে একে। ঝিনুকের বুক হইতে মুক্তা তুলিয়া মালা গাঁথিয়াছি আপনার মনে আলগোছে। আমার অন্তরের মন যাহা পাইয়াছে তাহাই লইয়াছি, আমার চয়নিকার ডালি এমন করিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে তাহারই ফসলে। এই ফসলের ডালি বিশ্বজনের বেদীতে আমি আমার পরিশ্রমের পরিতৃপ্তি প্রাণ মন ভরিয়া আস্বাদ করিতে চাই, আমার সাধনার ঠাকুরঘরে – ইহারাই আমার আরাধনার আরাধ্য দেবতা।